ছোটগল্পে দাঙ্গা ও দেশভাগ

নূর কামরুন নাহার

রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের সার্থক নির্মাণ। রবীন্দ্রযুগের আগে ছোটগল্প হয়নি এমন বলা যায় না, তবে তা ছোটগল্পে উত্তীর্ণ কি না এ নিয়ে নানা বির্তক ও সংশয় রয়েছে। সাহিত্যের নবীনতম শাখা ছোটগল্প জন্মমাত্রই বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকাশগুণে অনন্য হয়ে ওঠে। যেমন এর ভেতর সাহিত্য রসিক খুঁজে নেয় বিন্দুর ভেতর সিন্ধুর গভীরতা তেমনি গোগ্রাসে পান করে এর আঙ্গিক এবং উপস্থাপনার সৌন্দর্য, জীবনের বহুমাত্রিক দ্যোতনা ও পরিবেশনা। ছোটগল্পে জীবন ঘন হয়ে হয়ে নানা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাত্রা করে। মানুষের মনের অন্ধকার, আলো, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, জীবনবোধ সৌন্দর্যপিপাসা, উদগ্র জীবনাকাঙ্ক্ষা, কাম, পিপাসা, অস্তিত্বের লড়াই, সমাজ, দর্শন, শ্রেণি সংগ্রাম, প্রবঞ্চনা আত্মপ্রতারণা, প্রেম, মনোস্তত্ত্ব, হৃদয়ের আর্তি, হাহাকার, মানবিক বিপর্যয় এসব কিছুই উঠে আসে ছোটগল্পে। এই সবকিছুর ভেতর আবার ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে মানবিক প্রেম, ভালেবাসা, প্রণয়, হারানো প্রেম, বিরহ, কলহ, সংসার, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, ব্যক্তিগত বেদনা, সামাজিক সমস্যা ও সমাজসংস্কার। দেখা যায় পশুপ্রেমের কালজয়ী গল্পও। গ্রাম্য রাজনীতি, শ্রেণি রাজনীতি এবং রাজনীতি সচেতনার গল্পও দেখা যায় কিন্তু তা বিষয় হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে না। বাংলা গল্পের এই মানবিকতার জয়গান, ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা জীবন কিংবা প্রেম ও কাম, বিরহ বা দংশনের কাহিনি, চাওয়া-পাওয়া, এই ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চিরন্তন হাহাহার এই গণ্ডিবদ্ধ বিষয়গুলিতে প্রথম বিকট ও বিষম ধাক্কা আনে ছেচল্লিশের -এর দাঙ্গা আর সাতচল্লিশের দেশভাগ।

হিংসা-দ্বেষ, জাতি আর ধর্মবিভেদের নতুন একটা জগত যেমন দেখে এ উপমহাদেশ তেমনি বাংলা ছোটগল্পেও রচিত হয় নতুন এক জগত। বলা যায় নতুন মাত্রা যোগ হয় বাংলা ছোটগল্পে। বাংলা গল্প তার বিষয় ও বৈচিত্র্যে বাঁক বদল করে। দাঙ্গার ভয়াবহতা, লুঠ, হত্যা, নৃশংসতা, নির্মমতা, স্বার্থান্বেষীতা এবং ধর্মান্ধ মহলের অন্ধ উন্মাদনা, সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া বিষ ও বিদ্বেষ নিয়ে রচিত হয় অসংখ্য গল্প। এসব গল্পে রক্ত-ক্ষয়, লাস, মৃত্যু, বীভৎসতা মানুষের মধ্যে জমা হওয়া থকথকে হিংস্রতা, ঘৃণা, জীবনের প্রতি ক্রুর হাসি আর নির্মমতা ছবি হয়ে উঠে আসে ছোট গল্পে। আমরা এসব গল্পে দেখি রাস্তায় কাটা মুণ্ডু, পোড়া বসত বাড়ি, যুবতীর নগ্ন কাটা শরীর, অবলীলায় বন্ধুর বুকে বিধানো ছুরি, অবিশ্বাস ঘন হয়ে ওঠা চোখ, সন্দেহের কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়া আকাশ, রক্তস্রোতে আর পচা রক্তের গন্ধে ভারী বাতাস। পাশবিকতা, অমানবিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, পৈশাচিকতার ভয়াবহ বর্ণনার পাশাপাশি এসব গল্পে বেজে উঠে দাঙ্গাবিরোধী সুর ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা, মানুষের কথা, মানবিকতার

কথা। যেমন আমরা এসব গল্পে দেখি বন্ধুর বুকে নির্দ্বাধায় ছুরি ঢুকিয়ে দিতে ঠিক তেমনি আবার দেখি বন্ধুর পরিবারকে নিজ পরিবার থেকে বাঁচাতে নিজের বুকে ছুরির আঘাত নিতে।

দাঙ্গার বীভৎসতা কাটাতে না কাটাতেই আসে সাতচল্লিশের দেশভাগ। বাংলা ছোটগল্পের বিষয় ও প্রকরণে নবতর মাত্রা যোগ করে ইতিহাসের এই করুণ বাস্তবতা। দাঙ্গার গল্পের সাথে জোড় বাঁধে দেশভাগের বিষয়টি। উদ্বাস্তু মানুষের মিছিল, পূর্বপুরুষের ভিটা ও মাটি ছাড়ার মর্মন্তুদ কান্না, সর্বহারা সম্ভ্রমহারা মানুষ, রাজনীতির খেলায় খেলনায় পরিণত হওয়া মানুষ, লুটেরা আর স্বার্থান্বেষী মানুষের শিকারে পরিণত হওয়া মানুষই সাতচল্লিশ ও সাতচল্লিশ পরবর্তী গল্পগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। শুধু বিষয় নয় দেশভাগ মানুষের বোধ এবং বিশ্বাসে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পের শক্তিতে আঘাত হানে। যে আঘাত সুদূরপ্রসারী। আজন্ম যে মাটির সাথে গ্রথিত জীবন, যে মাটিতে মিশে আছে পূর্বপুরুষের রক্ত আর শরীরের ঘ্রাণ, শুধুমাত্র ধর্মের কারণে সে মাটি ছেড়ে যাবার যন্ত্রণা এবং দহন মানুষের মনোজগতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অসারতা, এবং রাজনৈতিক নেতাদের শঠতা এবং স্বার্থকে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। মানুষের মধ্যে নিয়ে আসে অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা। আসলে সে কি মানুষ? কি তার পরিচয়? ধর্মই কি তার পরিচয়? সে মানুষ এই পরিচয়ের থেকেও কি বড় ধর্মের পরিচয়? মর্মবেদনা আর শেকড় বিচ্ছিন্নতার পাশাপাশি গল্পের বিষয় হয় মানুষের প্রশ্ন আত্মপরিচয়ের জিজ্ঞাসা। আর এসব বিষয় নিয়ে রচিত হয় অসাধারণ সার্থক ছোটগল্প। উদ্বাস্তু মানুষ, ভিটেছাড়া মানুষ, শেকড় থেকে উপড়ে ফেলা, মানুষের মর্মভেদী কান্না, মৃত্যু, মানবতা এসব কিছুর শিল্পিত উপস্থাপন ছোটগল্পকে অন্যমাত্রায় ও উচ্চতায় স্থাপন করে।

দাঙ্গা এবং দেশভাগ নিয়ে এই উপমহাদেশের গল্পকার এবং কথাসাহিত্যিকরা লিখেছেন প্রচুর। সেইসব গল্পের বিষয়বস্তুতে একটা সমসুর দেখা গেলেও ভারত, বাংলাদেশ, এবং পাকিস্থানের গল্পকারদের গল্পের উপস্থাপন এবং হাহাকারে সুরে ভিন্নতা পরিলক্ষিত। এই ভিন্নতা ও সূক্ষ্ম প্রভেদ বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। এবং এ বিষয়ে অন্য এক প্রবন্ধে বলবার প্রত্যাশা রাখি। বর্তমান প্রবন্ধ এই উপমহাদেশের ছোট গল্পে দেশভাগ ও দাঙ্গার উপস্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পে উঠে আসে দুই ধর্মের দুই মানুষের প্রতি মমত্ব, উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ। এখানে বাঁচার জন্য দুজনেই ডাস্টবিনের দুইপ্রান্ত ধরে দাঁড়ায়। আমরা পরিচয় পাই একজন মিস্ত্রি, আর একজন নৌকার মাঝি, তারপর আমরা আবার পরিচয় পাই মিস্ত্রি হিন্দু আর মাঝি মুসলমান। জীবন মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে একে অপরকে অবিশ্বাস করলেও দুজনের চোখেই সন্দেহ ঘন হয়। আবার তারা বুঝতে পারে দুজনেরই জীবন বিপন্ন। তারা বেশি শিক্ষিত না তবু তারা প্রশ্ন করে কেন এই মৃত্যু মৃত্যু খেলা? এতে লাভ কাদের? তারপর তারা আবার মিলিত হয় একটি বিড়ি ধরিয়ে টান দেয় দুজন। আগামীকাল ঈদ। মাঝির কোমরে গোজা আছে মেয়ে আর ছেলের জন্য কেনা নতুন জামা। আটদিন ধরে সে বাসায় যেতে পারছে না। আজ তাকে যেতেই হবে চাঁদরাতে তার ছেলে মেয়ে এই নতুন জামা দেখে খুশি হবে। তাই মাঝি এগিয়ে যেতে চায়। মিস্ত্রির ততক্ষণে তার প্রতি গভীর মায়া জন্মে গেছে। তাই সে বাধা দেয় যেতে। কিন্তু মাঝির মন ছুটে গেছে তাই চলে যায়। মিস্ত্রি বলে- আদাব আবার দেখা হবে। মোড় ঘুরতেই মিস্ত্রি শুনে গুলির আওয়াজ। মাঝি নিশ্চয় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে।

তার কোমরে গোজা ঈদের নতুন কাপড়গুলো রক্তে ভিজে গেছে। কিন্তু দুইজনের এই আদাব বিনিময়ে ভালোবাসা রয়ে যায়। এইভাবেই রাজনীতি আর হিংসানীতির শিকার হয়েছে সাধারণ মানুষ কিন্তু তাদের মনের ভেতর ছিলো পরস্পরের প্রতি আদাব আর ভালোবাসা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উস্তাদ মেহের খাঁ' অবিশ্বাস আর বিদ্বেষের এক গল্প। গল্পে দেখা যায় শংকরকে ওস্তাদ তার সবটুকু ঢেলে গান শেখাচ্ছেন পনেরো বছর ধরে। পনেরো বছর ধরে একসাথে থাকায় ওস্তাদ মেহের খাঁ তার পরিবারের একজন হয়ে গেছেন। কিন্তু দাঙ্গার সময় এই ওস্তাদকে নিয়ে অনেকেই কুমন্ত্রণা দেয় শংকরকে। সে উড়িয়ে ফেলে দেয়। কিন্তু অবিশ্বাসের কীট তাকে কুরে কুরে দংশন করে-উস্তাদজি গুণি নন, উস্তাদজি আর কিছু নন, তিনি মুসলমান এবং ফলে তাকে বিশ্বাস করা চলে না ।

একদিন সে শুনতে পায় উস্তাদ যেন নিচু স্বরে কারো সাথে কথা বলছে। শংকরের সন্দেহ দৃঢ় হয়। সে জানতে চায় কার সাথে কথা বলছে। কিন্তু নিষেধ থাকায় উস্তাদ তার নাম প্রকাশ করে না। শংকর সন্দেহ করে অবিশ্বাস করে উস্তাদকে বাড়ি থেকে বের করেও দেয়। দাঙ্গায় উস্তাদ মারা যায়। কিন্তু দেখা যায় সে তার সবটুকু সংগীতরত্ন উজাড় করে শংকরের স্ত্রী রমা-কেই গোপনে গান শেখাচ্ছিলো । এইভাবেই অবিশ্বাস আর সন্দেহের বিষ ছড়িয়ে দাঙ্গায় বন্ধুকে শত্রু আর আপনজনকে বানানো হয়েছে পর। এতোবছর একসাথে থাকার পরও উস্তাদজি আপন হননি। একটা মহৎপ্রাণ 'মিয়া কি টোড়ির' কিংবদন্তীর শিল্পী এভাবেই মরে পড়ে থাকে কোলকাতার রাস্তায়। ধর্মের কারণে জমে ওঠা এই বিষ আর সন্দেহ মর্যাদা দেয়নি শিল্পীকে, মহৎ শিল্পীও ছাড় পায়নি মৃত্যু থেকে, এরকম অসংখ্য জীবন ক্ষয় দাঙ্গার নির্মম বাস্তবতা। সেটিরই প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে।

সলিল চৌধুরীর 'ড্রেসিং টেবিল' গল্পটিতেও অসামান্যভাবে প্রকাশিত হেয়েছে দাঙ্গার নির্মমতা, একটি ড্রেসিং টেবিল প্রতীক হয়ে ওঠেছে স্বপ্ন মোড়ানো এক সংসার, স্বপ্নভঙ্গ আর ধ্বংসলীলার চরম বাস্তবতার। ছাপোষা জুতার দোকানের সেলসম্যান শখ করে কিনে আনে একটি সেকেন্ডহ্যান্ড ড্রেসিংটেবিল। সেই ড্রেসিংটেবিলের দেরাজের মধ্য থেকে বের হয়ে আসে নীল খামে মোড়ানো চারটি চিঠি। সেই চিঠির ভেতরেই বর্ণনা করা আছে দাঙ্গার বিভিন্ন চিত্র, মানুষের পাশবিক উল্লাস, বীভৎসতার আর মানবিকতার চরম বির্পয়য়ের কথা।

চিঠিতেই লেখা আছে লঞ্চে রহিমুদ্দি নাম শুনে একজন বলে- ধরার উপায় নেই, দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালি, তাই নয় গো? রহিমুদ্দি আরো যেটা দেখেন তার দেয়া খাবারটা ছেলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেন মহিলাটি। এভাবেই হিন্দু-মুসলমান সর্ম্পকের বিষবাষ্প দেখা যায় এই গল্পে। আমাদের মনে পড়ে যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর 'নেড়ে' গল্পের কথা। যেখানে পরম উপকার এমনকি গয়নার বাক্স উদ্ধার করে দেবার পরও মুসলমান পরিচয় জানতে পেরে চেঁচিয়ে উঠেন সহযাত্রী ভদ্রলোক বলেন- 'দিলেন তো আমার জাত মেরে'। তেমনি এই গল্পে তারপর আমরা চিঠিতে আবার দেখি ঘনিষ্ট বন্ধু অমলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা চলে যাওয়ার কথা। আর সেই সাথে দেখি একটি মৌলিক প্রশ্ন -অমলের দেশ ছেড়ে যদি অমলকে চলে যেতে হয়, আমার দেশকেই বা আমি আঁকড়ে থাকব কোন যুক্তিতে?

চতুর্থ চিঠিটিতে আমরা পাই একটা ভগ্ন মানুষকে, যে অনুভব করে-মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে গেছে বীভৎস তাণ্ডব চলছে পশুত্বের। তারপর দেখি সম্পূর্ণ বিধ্বংস্ত মানুষের

বুকভাঙ্গা আর্তনাদ- বড়ো অহংকার ছিলো আমার দেশকে আমি চিনে ফেলেছি- সে অহংকার চূর্ণ হয়েছে। মনুষ্যত্বকে বড়ো করতে গিয়ে পশুত্বকে ছোট করে দেখেছি তাই পশুর প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। এরপরের অংশ আরো করুণ। সেই সেলসম্যান পরে হাওড়া গিয়ে খোঁজ করেছিলেন শিল্পী রহিমুদ্দির বাড়ি। তখন কেউ একজন বলে- এ পাড়ায় কোনো নেড়ে- ফেড়ে আর নেই মশাই। রহিমুদ্দির খালি বাড়িতে তখন আশ্রয় নিয়েছে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুরা। এক মধ্যরাতে ঐ ঘরে আগুন দেবার পর আর খোঁজ মেলেনি আর রহিমুদ্দির স্ত্রী আমিনার। হাওড়ায় দেখা যায় রং তুলি নিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে একজন। ধারণা করা হচ্ছে তিনি পাকিস্তানের গুপ্তচর। সে পাগলের ভান করছিলো। আমরা বুঝে নিই রহিমুদ্দির পরিণতিও। এই হলো দাঙ্গায় সর্বশ্রান্ত মানুষের চিত্র। এই হচ্ছে আমাদের প্রতিহিংসার আগুনের চিত্র। মানুষে-মানুষে, গোত্রে-গোত্রে, ধর্মে-ধর্মে অসার বিবাদমান মানুষের ধ্বংস হয়ে যাবার নিষ্ঠুর চিত্র।

সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা' গল্পে উঠে এসেছে দাঙ্গার ছবি । গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি এক নিরীহ লোককে পেছন থেকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলা হচ্ছে। গল্পের নায়ক অমল কমিউনিস্ট পার্টি করে। অজয় তার ভাই। সে আবার হিটলারকে পছন্দ করে। এই দ্বি-মুখী দ্বন্দ্বে দুভাই নানা কথা বলে, বলে বিপ্লবের কথা। অজয় বলে- বিপ্লব কখনো মরে না। শহর কিন্তু তখন অস্বাভাবিক। সন্ধ্যে হলেই কারফিউ। মানুষ মারা যাচ্ছে অকাতরে। একরাতে ফেরে না অমলের বাবা। মা ফুঁপিয়ে কাঁদেন। বিমল নামে এক বন্ধু সূর্যবাবু নামে একজনের বাড়িতে নিয়ে যায়। স্টীমার অফিসে ফোন করে বিমল। ওপাশ থেকে নির্লিপ্ত কণ্ঠ বলা হয়, খুঁজে দেখছি।

বাসায় ফিরে দেখে মায়ের ছলছল চোখ। ভাই অজয় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ইস্তেহার পুড়াচ্ছে, বলছে- মড়া পুড়াই। কয়েকদিন পরে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একটা সভায় যাচ্ছে অশোক। দেখে একজায়গায় তাজা রক্ত। কার রক্ত কে জানে? কিন্তু মনে পড়ে সব। ভেতর থেকে উঠে আসে সেই অবিনাশী প্রশ্ন-এইসব চক্রান্ত কবে বন্ধ হবে?

মানুষে মানুষে এই লড়াই, ধর্মের সংঘাত তো এখনো থামেনি, মানবিক একটা পৃথিবীর জন্য যুদ্ধ তো এখনো থামেনি। কারা যেন মানবতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেই যাচ্ছে। আর সেই চক্রান্তের শিকার হচ্ছি আমরা সবাই।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৮৭) 'কলিকাতা নোয়াখলি বিহার' গল্পগ্রন্থের তিনটি গল্প 'বিশ্বাস', প্রায়শ্চিত্ত' এবং 'সত্যাগ্রী' যথাক্রমে কলকাতা-নোয়াখালি এবং বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা। 'বিশ্বাস' গল্পে আমরা দেখি কিভাবে দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাস অবিশ্বাসের পাঁকে হারিয়ে যায়। গল্পে পরেশ আর রহমানের অকৃত্রিম বন্ধুত্বও নেভাতে পারেনি জাতি-ধর্ম বিভেদের প্রজ্জ্বলিত আগুনকে। সাম্প্রদায়িকতা বন্ধু রহমান পাল্টে দিয়েছিলো, তবু সে পরেশকে সাবধান করে বলেছিল বাড়ি থেকে সরে যেতে। পরেশের বিশ্বাস ছিলো মন্ত্রীবন্ধুর শক্তিতে, বিশ্বাস ছিলো তিরিশ বছরের বন্ধুত্বে। তাই বাড়ি ছাড়েনি সে। কিন্তু দাঙ্গায় শুধু হলো অবাধ লুঠতরাজ, হত্যা আর অগ্নিকাণ্ড। দেখা গেল পরেশের পুড়ে যাওয়া বাড়িতে নেই একটি প্রাণীও। কিন্তু দাঙ্গা তো শুধু পরেশের জন্য নয়, অসংখ্য মানুষের মতো রহমানের পরিবারও সম্মুখীন হলো বলির। রহমান উদ্‌ভ্রান্ত ছোটে, পুলিশে ফোন করে, না কোনো আশা মিলে না, সাড়া পায় না কারো। প্রতিহিংসার দাউ দাউ আগুনের সামনে রহমান অনুধাবন করে হিন্দু-মুসলমান কেউ বাঁচবে না, কেউ না। শুধু শকুনেরা উল্লাস করবে স্বার্থ উদ্ধারে। ঠিক তখুনি সে দেখতে পায় তার শিশু কন্যা নূরীকে বুকে আগলে

রেখেছে পরেশ। এখানেই যেন দেখি মনুষ্যত্বের জয়, আর ঘন অন্ধকার আর নিরাশার মধ্যেও দেখি মানবিকতার জয়ের আশার প্রদীপটি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটবড়' (১৯৪৮ সালে প্রকাশিত) গল্পগ্রন্থে দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অসম্প্রীতির বেশ কয়েকটি গল্প দেখা যায়। 'স্থানে ও স্তানে' গল্পে আমরা দেখি নিরাপত্তাহীন মানুষের বিশ্বাস একবারেই নড়বড়ে। কোথাও যে সে নিরাপদ নয় এই বোধ তাকে অসহিষ্ণু করেছে, করেছে সংশয়বাদী। গল্পের নরহরি তারই শিকার। দেশবিভাগের ডামাডোলের সে দৃঢ় থাকে, সে জন্মভূমিতেই থাকবে। ঢাকার ছেলে নরহরির শ্বশুরবাড়ি কোলকাতায়। একসময় কোলকাতাকে তার আপন মনে হতো এখন মনে হয় কোলকাতাই যেন বিষ উদ্গীরণ করে দিয়েছে এই দাঙ্গার আর সাম্প্রদায়িকতার। ১৫ আগস্টের আগেই কলকাতা যায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ঢাকাতে নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে জামাই আদরের কোনো বিঘ্ন না ঘটলেও দেখা যায় কেউ এখন সুমিত্রাকে ঢাকা পাঠাতে রাজি নয় । এমনকি তার স্ত্রী সুমিত্রাও মোটেই রাজি নয় এমন জায়গায় যেতে, তাই নরহরি যখন বলে- "যদি না যাও আমার সঙ্গে এখন, বাকি জীবনটা বাপের বাড়িতেই কাটাতে হবে তোমার-বিধবার মতো।" তখন সুমিত্রা বলে- আমায় নয় মেয়ে ফেলো তুমি। আর্তনাদ করে উঠে সুমিত্রা, রাতবিরেতে কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে আমাকে, যা খুশি করবে আমায় নিয়ে, তার চেয়ে তুমিই আমায় মেরে ফ্যালো নিজের হাতে। গল্পের সমাপ্তিতে আমরা দেখি একটা সরল উপমায় প্রতীকে মাতৃভূমির প্রতি হৃদয়ের আকুতি, " কোথায় যেন ছোট একটা ছেলে কাঁদছে। এ বাড়িতেই বোধ হয়, আর ছেলেটার মতো গলা। অন্যের কাছে থাকতে না চেয়ে মার জন্যই বোধহয় কাঁদছে।" সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পটভূমিতে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের আরো বেশ কয়েকটি গল্প রয়েছে। রচিত আলোচ্য গল্পগুলো প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য: এ বিদ্বেষের নগ্নরূপ মানিক আঁকলেন 'ছেলেমানুষি' ভালবাস' 'স্থানে ও স্তানে' প্রভৃতি গল্পে, যার বক্তব্য তীক্ষ্ণ হলেও রূপ নির্মাণে লেখক বিশেষ মনোযোগী নন। কিন্তু ড. সরোজমোহন মিত্র বলেন ভিন্ন কথা, "... মানিকের উত্তর কালের প্রতিটি গল্পই রাজনীতিসচেতন। প্রতিটি গল্পে একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য আছে। আশ্চর্যের কথা হোল, রাজনীতি বা বক্তব্য কখনোই মানিকের গল্পের শিল্পরূপকে ব্যাহত বা শিথিল করেনি।"

মানিকের 'সুবালা' গল্পে নদীর দেশের মেয়ে সুবালা শিশুসন্তান সহ কলকাতা এসেছে উদ্বাস্তু হয়ে। সবাইকে লুকিয়ে ভিক্ষা করে সে। তাকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখে ক্রুদ্ধ স্বামী হরেন শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে যায় তার কাছে থেকে। শূন্যকোল সুবালা ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে রাধুঁনির কাজ নেয়। তারপর একদিন আচমকা সুবালার স্বামী হরেন ছেলে সহ এসে হাজির হয়-তাদের পরনে ফরসা জামাকাপড়। স্বামী পুত্রকে ফিরে পেয়ে সুবালা যখন সুখী, তখনই মাঝরাতে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল হরেনকে-ছিনতাইয়ের অভিযোগে। হরেন স্ত্রীকে ভিক্ষা করতে নিষেধ করে যায়-তার মতে, "তার চেয়ে মরণ ভাল।" পূর্ববাংলার এই উদ্বাস্তু মানুষদের আঁকতে গিয়ে মানিক তাদের উদ্যমী, সংগ্রামী ও আত্মমর্যাদাশীল চরিত্র অংকন করেছেন। দেখিয়েছেন তারা উদ্বাস্তু কিন্তু ভিক্ষুক নয়। তাদেরও আছে সম্মান আর মর্যাদাবোধ।

নন্দিত কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন 'জাগরী' উপন্যাসের মাধ্যমে। তার 'গণনায়ক' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। গল্পের প্রধান চরিত্র মুনীমজি অর্থাৎ, একজন গোমস্তা। বিহারের পূর্ণিয়া জেলা আর বাংলার দিনাজপুর জেলার মধ্যে সীমারেখা নাগর নদী, নদীর কাঠের পুল পার হয়ে বাংলাদেশে যায় গরু,

মোষ, চিনি, ঘি। আর বাংলাদেশ থেকে আসে ধান-চাল। এই দেয়া-নেয়ার কমিশন লোটেন মুনীমজী আর ইজারাদার সাহেবের মতো লোকেরা। এই সুযোগ আরও বেড়ে যায় দেশবিভাগের সময়ে। সবাই যখন অস্তিত্ব সংকটে উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষায় কমিশনের রোয়েদাদের। সেই সুযোগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ, আতঙ্ক আর নানা রকমের গুজব প্রচার করে রাতারাতি গণনায়ক হয়ে বসেন মুনীমজী। কমিশনের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবার ভাঁওতা দিয়ে সরল দরিদ্র মানুষদের কাছ থেকে চাঁদা আর উৎকোচ গ্রহণ, দেশপ্রেমিক সেজে লুণ্ঠন আর অবৈধ অর্থোপার্জন সমানে চলে। গুজবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে শরণার্থীদের ভিড়। রিফিউজি ক্যাম্পের সুবাদেও মুনীমজীর ট্যাঁকে পয়সা জমে। জলের দামে জিনিসপত্র-জমিজিরাত কিনতে থাকেন আতঙ্কিত দুর্ভাগা মানুষের কাছ থেকে। মুখে জনদরদি বুলি। পয়সার বিনিময়ে কংগ্রেস আর লিগের ঝান্ডাও সরবরাহ করেন মানুষের কাছে। কমিশনের রায় বের হলে দেখা যায় মুনীমজীর কথা ঠিক হয়নি। পকিস্তানে পড়বার জায়গা হিন্দুস্থানে পড়েছে আর হিন্দুস্থানে পড়বার থানাগুলো পাকিস্তানে পড়েছে। এই মিথ্যারে ফায়দা লোটেন মুনিমজি। পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ রাখা নিষেধ বলে আগের বিক্রীত পতাকাগুলো সংগ্রহ করেও নেন লোকের কাছ থেকে, মনে মনে স্থির করেন, সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানি এলাকায় গিয়ে এগুলো বিক্রি করে দেবেন। একই কাজ করবেন সেখানকার হিন্দুস্থানি পতাকা নিয়ে। এক জিনিস দুবার করে বেচবেন। "কমিশন অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে, আবার অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু এই কমিশনের রায়ের কমিশন বাবদ তাঁর প্রাপ্য তিনি পেয়ে গিয়েছেন। হিসেবে কোথাও ভুল হয়নি।" এইভাবেই মধ্যসত্ত্বভোগী মুনিমজি তার স্বার্থ ঠিক রাখেন যেমন ঠিক রাখে দুর্যোগের সুবিধা লোটা মানুষেরা। তাদের কোনো নীতি নেই, আছে শুধু মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা বানানোর ধান্ধা।

দেশবিভাগ এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে একটি চমৎকার গল্প নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক'। 'পালঙ্ক' গল্পের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বৃদ্ধ বিপত্নীক রাজমোহন ওরফে ধলাকর্তা দেশভাগের পরও পাকিস্তান ছাড়তে রাজি হননি। পুত্র সুরেন সপরিবারে কলকাতা নিবাসী হয়েছে। পুত্রবধূ চিঠি লিখে তার বাপের বাড়ির দেওয়া কারুকার্যখচিত পালঙ্কটি বিক্রি করে টাকা পাঠিয়ে দিতে বললে দুঃখ অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রাজমোহন। পুত্রবধূর বাবার বাড়ির জিনিস হলেও এটা এখন তার নিজের ঘরের সম্পত্তি। এটাকে বিক্রি করার অর্থ হচ্ছে নিজের সম্মান সম্ভ্রম বিকিয়ে দেয়া। দরিদ্র মকবুল পালঙ্কটি কিনতে চাইলে পত্রপাঠমাত্র রাগের মাথায় পালঙ্কটি নামমাত্র মূল্যে তাকে দিয়ে দেন। রাগ চলে গেলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বারবার তিনি ফিরিয়ে আনতে চান পালঙ্কটি। কিন্তু মকবুলের গোঁ ধরে, পালঙ্ক বেঁচবে না। ধলাকর্তার আছে কূটবুদ্ধি। পূর্ব পাকিস্তানে তিনি সংখ্যালঘু হলেও হতদরিদ্র মকবুলকে এখনও তিনি ভাতে মারার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর সঙ্গে হাত মেলায় সুবিধাভোগী অবস্থাপন্ন মুসলমানরাও। মকবুলের কাজে ভাটা পড়ে, পেটে টান পড়ে। উর্পাজনের একমাত্র অবলম্বন গাইটা বিক্রি করে দেয় সে। একটা নৌকা কিনে। কিন্তু সে নৌকাও চুরি হয়ে যায়। মকবুলও এক সময় অনুধাবন করে, "গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে... ।" ধনী দরিদ্রের এই অসম লড়াইয়ে মকবুল যখন পরাজিতপ্রায়, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, স্ত্রীসন্তানদের মুখ চেয়ে পালঙ্ক বিক্রি না করে আর উপায় নেই। তখনই ধলাকর্তা আসে মকবুলের বাড়িতে। মকবুল তাকে বলে আপনার পালঙ্ক নিয়া যান

"সেই ধোঁয়া ওঠা ক্ষীণ দীপের আলোয় মুহূর্ত কাল দুই যুগের দুই পালঙ্ক প্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্ক প্রেমিক, ধলা আর কালো। দুই রঙের দুই পালঙ্ক প্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।"

সে দৃষ্টি মায়ার আর সমঝোতার। সে স্ত্রী ফাতেমাকে ডেকে বাচ্চা দুটোকে নিচে শোয়াতে বলে তৎক্ষণাৎ মন বদলে গেল রাজমোহনের। আপনজনহারা শূন্যপুরী আগলে রাখা নিঃসঙ্গ ধলাকর্তা যেন খুঁজে পান স্বজন। অনুভব করেন পালঙ্কের প্রকৃত কদর "আজই আর আমার চৌদোলা খালি না, আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে।" দেশবিভাগের এই স্বজনহীনতা, মানুষের বোধের জায়গায় প্রবল আঘাত, এইসব কিছু বদলে দিয়েছিলো আভিজাত্যবোধ আর পূর্বের লালিত অনেক ধারণাকে। সবকিছুর যেন একটা সমান্তরলীকরণ দেখা যায় দেশভাগের এই প্রবল ঘূর্ণিতে। যে ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেয়ে মানুষ বুঝতে পেরেছে এখানে সবাই নানাভাবে আক্রান্ত হয়েছে। কি ধনী, কি দরিদ্র। মানুষ এখানে নানাভাবে নিঃস্ব হয়েছে। কেউ বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে, কেউ আভিজাত্য, সম্পদ আর ক্ষমতা থাকার পরও দেশভাগে হয়েছে স্বজনহীন, নিঃস্ব। আবার এটাও বুঝিয়ে দিয়েছে জঠরের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে ধর্ম নেই, জাত নেই, স্বজাতিও নেই, এমনকি দেশ আর দেশভাগও নেই। এভাবেই দেশভাগের এইসব গল্পে উঠে আসে নির্মম বাস্তব আর মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

অচিন্ত্যকুমারের 'স্বাক্ষর, দরিদ্র দুজন হিন্দু-মুসলমান-দীননাথ আর জহুরালির বন্ধুত্বের গল্প, যেমন আমরা দেখেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'খতিয়ান' কিংবা সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পে। পাশাপাশি বস্তিতে থাকে দুই ফেরিওয়ালা-ছোটলোক তারা ছোট ছোট কাজ করে-ছোট তাদের জীবনের বৃত্ত-চাওয়া পাওয়া। কিন্তু একদিন তাদের বন্ধুত্বের ওপর ছিটকে পড়ল অবিশ্বাস। একদিন তারা নিজেদের আবিষ্কার করল মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষ দলে, একজন ইঁট ছুঁড়ছে, অপরজন বোতল, একে অন্যকে জখমের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারপর তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে মিলিত হয়ে একটি জায়গায়। পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে নিভে যাওয়া বিড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দুজন পালা করে টান দিয়ে সেটাতে-আগুনের অক্ষরে আবার এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে তারা। এভাবে অন্তরের ভেতরে গাঁথা যে সৌহার্দ যে ভালোবাসা তাই যেন ফুটে উঠেছে এই গল্পে একটি বিড়ির আগুনের স্বাক্ষরের প্রতীকে।

দেশবিভাগ নিয়ে প্রতিভা বসুর উল্লেখযোগ্য দুটি গল্প প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায়, 'দুকূলহারা' এবং 'অপরাহ্নে' শিরোনামে। দুটি গল্পেরই কেন্দ্রীয় চরিত্র বৃদ্ধা বিধবা নারী। 'দুকূল হারা' গল্পের বিন্দুবাসিনী দেশবিভাগের পরও ভালই ছিলেন তাঁর ছোট্ট তালুকদারিতে বিধবা পুত্রবধূ এবং দুটি নাতনি সহ। কিন্তু শোনা গেলো ভারত পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা চালু হবে, আবার ভয়ের ঢেউ উঠল সংখ্যালঘুদের মধ্যে। পাগলের মতো মানুষ আবার ছুটল সীমানা পেরিয়ে। বিন্দুবাসিনীও চিন্তিত হলেন। এতদিনের বিশ্বস্ত জমির মিঞাও শোনাতে পারলেন না কোনো ভরসার কথা, তখন দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্তই নিতে হল। পথে সাথে নেয়া টাকা-পয়সা সোনাদানা সবই প্রায় খুইয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় হিন্দুস্থানের মাটিতে পা রাখলেন বিন্দুবাসিনীরা। আর যে মর্যাদা, যে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এসেছিলেন, এক এক করে তা-ই খোয়াতে লাগলেন। খোলা মাঠে রাত কাটিয়ে রিলিফের দুধ-চিড়া-গুড় নিতে হল ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে। 'এর চেয়ে বাড়িতে থেকে আমাদের মরাও ভালো ছিলো।' পুত্রবধূটির

এ উপলব্ধি যে কত সত্য পরবর্তী ঘটনাগুলো তাই প্রমাণ করে। সন্ন্যাসীবেশে ভণ্ড কেশবানন্দের খপ্পরে পড়লেন তাঁরা। ইতিমধ্যে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে একটি নাতনি মরে বাঁচল। কদিন পরে গভর্নেসের চাকরির কথা বলে পুত্রবধূটিকে বাপের বয়সী লম্পটের কামনার যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য নিয়ে যায় কেশবানন্দ। পরের শিকার মিলু, কিশোরী সুন্দরী নাতনিটিকে দিয়ে এল আর এক বাঘের মুখে 'বাস্তুহারার বেদনা' ছবির নায়িকা হবার জন্য। ওদিকে অপেক্ষা করছেন বিন্দুবাসিনী। তারপর কেশবানন্দ তাঁকে নিয়ে চলল পুত্রবধূ আর নাতনির সাথে দেখা করবার কথা বলে। শহর ছাড়িয়ে নির্জন প্রান্তরে পৌঁছালে জিপ গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে বিন্দুবাসিনীকে ফেলে দিল কেশব, বিশাল এক পাথরের ওপর আছড়ে পড়ল তাঁর মাথা, সব সমস্যা আর যন্ত্রণার নিষ্পত্তিও হয়ে গেল সেই সাথে। এ গল্পে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটেছে একের পর এক। স্বদেশ থেকে সর্বস্ব হারিয়ে চলে যাওয়াই যথেষ্ট বেদনাবহ ঘটনা, তার ওপর একে একে নাতনির মৃত্যু, বিধবা পুত্রবধূ এবং কিশোরী নাতনির পরিণতি, সব শেষ বিন্দুবাসিনীর মর্মান্তিক জীবনাবসান– একের পর এক নির্মম আঘাতে পাঠক যেন বিবশ হয়ে পড়ে। কিন্তু এ সবই হচ্ছে দেশবিভাগের বাস্তবতা। অসহায় মানুষের অসহায় অবস্থার শিকার হওয়ায় কঠিন নির্মমতার ছবি। প্রতিভা বসুর 'দুকুলহারা'-তে ফুটে উঠে সাম্প্রদায়িকতার ছড়ানো বিষ, মানুষের অসহায়ত্ব। দাঙ্গার নির্মম শিকার ও বলির করুণ চিত্র। কিভাবে দাঙ্গা গৃহবধূকে বারবনিতায় পরিণত করে কেমন করে এক সময়ের জমিদার পরিবার বিত্ত, অভিজাত্য, সম্ভ্রম হারিয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়, কিভাবে অরক্ষিত হয়ে পশুর মতো মরে পড়ে থাকে রাস্তায় তার যথাযথ প্রতিফলন এই গল্প।

১৯৫০ সালে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং হাসান হাফিজুর রহমানের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় গল্পসংকলন-দাঙ্গার পাঁচটি গল্প। এ সংকলনের মুখবন্ধে লেখা ছিলো, "আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে বটেই, পরোক্ষভাবেও দাঙ্গার ভয়াবহতা আজ বিষিয়ে তুলেছে। এ বিষের নীল ভয়ংকরতা নিঃশেষে মুছে দিয়ে নতুন জীবনের সূর্য উঠবেই। সে সূর্যের অধীর প্রতীক্ষায় আমরা দিন গুনছি'।

এ বইটিতে মূলত গল্প ছিলো চারটি আর একটি ছিলো মনীর চৌধুরীর একাঙ্ক নাটক। চারটি গল্পের মধ্যে দুটো ছিলো অনূদিত গল্প। একটি কৃষণ চন্দরের পেশোয়ার এক্সপ্রেস অন্য একটি খাজা আহম্মদ আব্বাসের 'প্রতিশোধ'। দেশবিভাগের কারণে পাঞ্জাবে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ আর প্রাণক্ষয় সম্ভবত এই উপমহাদেশের সবচেয়ে ভয়ংকর দাঙ্গা। পাঞ্জাবের সেই ভয়ংকর দাঙ্গা এবং দাঙ্গার শুরুতে শরণার্থী বিনিময়ের ভয়ংকর দৃশ্য তুলে ধরেছে 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পটি।

দেশভাগের বেদনা সবচেয়ে মর্মান্তিকভাবে উঠে এসেছে উর্দু গল্পকার কৃষণ চন্দরের ' পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পে। এখানে পেশোয়ার এক্সপ্রেস নামক রেলগাড়িটি নিজেই উত্তম পুরুষের ভাষায় ঘটনার বর্ণনা দিয়ে যায়। পেশোয়ার শহর থেকে হিন্দু শরণার্থীভরা বগি নিয়ে যাত্রা শুরু করে এ ট্রেন। পেশোয়ার, মর্দান, কোহাট, চরসদ্দা, খাইবার, লান্ডিকোটাল, নওশেরা ও মানশেরার বাসিন্দা এসব হিন্দু মানুষ। এদের ভাষা পশতু আর পাঞ্জাব। পাকিস্তানে আর জানমালের নিরাপত্তা নেই, তারা চলে যাচ্ছে ভারতে। অথচ সে দেশটি আগে তারা কোনোদিন দেখেনি।

হাসান আবদাল স্টেশন থেকে আরো একদল শরণার্থী যোগ দেয়। এরা শিখ। চোখেমুখে ভয়। ডাগর ডাগর চোখের শিশুগুলো পর্যন্ত ভয়ে কম্পমান। তক্ষশীলা স্টেশনে এসে এক্সপ্রেসকে থামতে হয় খানিকটা। স্টেশন মাস্টার জানান একদল

হিন্দু শরণার্থী আসছেন। কিন্তু আসে দুশো মৃতদেহ। সৈন্যরা প্রতিটি বগির মাঝ বরাবর দুশো লাশ ভাগ করে রেখে দেয় সৈন্যরা। ট্রেনটি মাত্র চলা শুরু করেছে অমনি একজন চেইন টেনে থামিয়ে দিলো। এবার দলনেতা বললেন, দু শো হিন্দু বাসিন্দা চলে যাওয়ায় তাদের গ্রাম শূন্য হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ট্রেন থেকে দু শো হিন্দু ও শিখ যাত্রীকে নামিয়ে দিতে হবে। তাই করা হলো। বালুচ সৈন্যরা বিভিন্ন বগি থেকে পছন্দমত দুশো যাত্রীকে নামিয়ে তাদের হাতে তুলে দিলো।

জায়গাটা তক্ষশীলা। এখানেই ছিলো এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে, এর গ্রামে গ্রামে শোনা যেত বুদ্ধের সঙ্গীত। প্রেম, সত্য আর সৌন্দর্যের বাণী এখানে বসেই লেখা হয়েছিল। এখানে হত্যা চলল নির্বিবাদে। প্লাটফর্মে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। এরপর সে পিচ্ছিল পথ ধরেই এগুতে লাগল কৃষণ চন্দরের পেশোয়ার এক্সপ্রেস।

রাওয়ালপিন্ডি এসে থামল গাড়ি। পনেরো-বিশজন পর্দানশীন নারী ও কয়েকজন যুবক পেশোয়ার এক্সপ্রেসের বগিতে ঢুকে পড়ল সাথে রাইফেল আর গোলাবারুদ। ঝিলাম আর গুজরখাঁর মাঝামাঝি স্থানে রেল থামিয়ে দিয়ে নারীদের নিয়ে যুবকের দল নামতে গেলে, পর্দানশীন নারীরা ঘোমটা সরিয়ে আচমকা চিৎকার করতে থাকে,'আমরা শিখ, আমরা হিন্দু, ওরা জোর করে আমাদের নিয়ে এসেছে।' যুবকেরা হেসে উঠে,'তোরা তো আমাদের লুঠের মাল। ঘর থেকেই ধরে এনেছি। যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করব। কে বাধা দেবে আমাদের?' কিছু হিন্দু পাঠান যুবক বাধা দেয়। পনেরবিশজন যুবকের প্রাণ যাওয়ার পর মেয়েগুলোকে নিয়ে ওরা নেমে পড়ল। আর কালো ধোঁয়ায় মুখ লুকিয়ে ছুটে চলে পেশোয়ার এক্সপ্রেস।

লালামুসা স্টেশনে এসে বগির ভেতরে থাকা পচা লাশের দুর্গন্ধে টেকা মুশকিল হলে বালুচ সেনারা সিদ্ধান্ত নেয় লাশগুলোকে বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। যেসব যাত্রীদের পছন্দ নয় তেমন যাত্রীদের ডেকে লাশগুলো দরজার কাছে এনে বাইরে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সৈন্যরা। এরপর সেইসব যাত্রীদেরও বাইরে ফেলে দেওয়া হয় চলন্ত ট্রেন থেকে। এতে ভালোই হয়। যাত্রী সংখ্যা কমলে খানিকটা হাত পা খুলে বসতে পারে শরণার্থীরা।

লালামুসা থেকে পেশোয়ার এক্সপ্রেস পৌঁছে ওয়াজিরাবাদে। প্লাটফর্মে ছড়ানো-ছিটানো মৃতদেহ। দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। স্টেশনে কাছে শোনা যাচ্ছে কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি। অট্টহাসি আর উন্মত্ত জনতার করতালি। যেন বৈশাখী উৎসব। এরপর দেখা গেল একদল উলঙ্গ মেয়ে নিয়ে এগিয়ে আসছে জনতা। বৃদ্ধা-তরুণী, বাচ্চাকাচ্চা সবাই দিগম্বর। মেয়েদের সবাই হিন্দু, শিখ আর পুরুষগুলো মুসলমান।

এবার পেশোয়ার এক্সপ্রেস থামে লাহোর প্ল্যাটফর্মে। দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে অমৃতসর থেকে ছেড়ে আসা আরেকটি ট্রেন। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে ট্রেনটি মুসলমান শরণার্থীদের নিয়ে এসেছে। জানা গেল এ ট্রেনটিকে পথে থামিয়ে চারশ শরণার্থীকে খুন করা হয়েছে। নিয়ে যাওয়া হয়েছে জনাপঞ্চাশেক মুসলমান স্ত্রীলোককে। বাকিদের লুণ্ঠন করা হয়েছে ইচ্ছেমতো। এবার সে ট্রেন থেকে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী এসে পেশোয়ার এক্সপ্রেসের চারশ যাত্রীকে নামিয়ে নিয়ে গেল। পঞ্চাশজন শিখ ও হিন্দু নারীকে একইভাবে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বদলা নেওয়ার জন্য।

মোগলপুরায় এসে সৈন্যবদল হলো। বালুচদের জায়গায় এলো শিখ ও ডোগরা সেনা। আটারি স্টেশন থেকে দৃশ্য পুরোপুরি পাল্টে গেল। হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা অসংখ্য মুসলিম শরণার্থীর লাশ পড়ে থাকতে দেখতে পেল। এবার খুশিতে তারা

আত্মহারা। বোঝা গেল স্বাধীন ভারতের সীমানায় এসে গেছে পেশোয়ার এক্সপ্রেস।

পেশোয়ার এক্সপ্রেস অমৃতসর স্টেশনে পৌঁছে দেখে শিখরা শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ কাঁপিয়ে তুলছে। এখানেও মুসলমানদের লাশের স্তুপ। হিন্দু, রাজপুত আর ডোগরারা বগিতে উঁকি মেরে মেরে শিকার তালাশ করতে থাকে। অমৃতসর থেকে চারজন ব্রাহ্মণ উঠে বগিতে। তারা হরিদ্বার যাবে। মাথা ন্যাড়া, কপালে তিলক। অমৃতসর থেকে অস্ত্রশস্ত্রসহ শিখরা পূর্বপাঞ্জাব অভিমুখী ট্রেনে চেপে বসে। তারা শিকারের খুঁজে ঘুরতে থাকে। তাদের সন্দেহের চোখ থেকে রেহাই মেলে না তীর্থযাত্রীরা ব্রাহ্মণদেরও। একজন জিজ্ঞস করে, 'তা ব্রাহ্মণ দেবতা যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

তাদের হত্যা করা হয়। বাঁচার জন্য ব্রাহ্মণ সেজেও মুক্তি মেলে না। এখানেও দেখা যায় উন্মত্ততা। পাশার দান যেন পাল্টে গেছে। এবার শ'য়ে শ'য়ে মুসলিমদের শবদেহ পথেঘাটে। যারা হিন্দু সেজে পালাতে চাইছিল, তাদের খৎনা পরীক্ষা করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছিল। এমনকি যেসব নিরীহ মুসলমান চাষি পরিবার নিয়ে বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল, তাদেরও ধরে এনে বর্শায় বিঁধিয়ে হত্যাযজ্ঞে মাতোয়ারা হয়েছিল হিন্দুরা। সেই উৎসব এতটাই নৃশংস ছিল যে, একজন জাট বর্শার ডগায় মুসলিম শিশুর লাশ গেঁথে "দেখো, বৈশাখী জটা এনেছি" গানও বেঁধে বসেছিল।

এর পরই ঘটে আরেক ঘৃণ্য আর নারকীয়তার ঘটনা; জলন্ধরের গ্রামে। পাঠান পুরুষদের হত্যা করে পাঞ্জাবের সুজলা সুফলা মাঠে চলে গ্রামীণ নারীদের মর্যাদাহানির নারকীয় তাণ্ডব। কিন্তু দিনকয়েক আগেই এখানে ছিল প্রাণের মেলা, হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি খেতে বীজ বুনত, ভাগ করে নিত দুপুরের রুটি-লচ্ছি। এখানেই প্রেমের গীত গেয়েছিল হির-রাঞ্ঝা, সনি-মাহিওয়াল আর মির্জা-সাহিবানরা; সেই প্রেমের ক্ষেত্রের কী নিদারুণ অপমান! সেই লাশগুলো বয়ে নিয়ে ফেলা হল সামনের খালে। এরকমভাবে যতই এগোলো ট্রেন, ততই মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করল হাত হিন্দুরা। এভাবে আম্বালায় এক মুসলিম ডেপুটি কমিশনার ও তার পরিবার হয় শেষ, ঘেন্নার বলি। সেই পরিবারের মেয়েটার হাতে সমাজতন্ত্রের বই ছিল, মেয়েটার চোখে দেশ ও জাতিকে বদলে দেবার স্বপ্ন ছিল; অথচ নিমেষে ছুরির এক পোঁচেই সব নিভে গেল!

কৃষণ চন্দরের এ গল্পের শেষে এসে পেশোয়ার এক্সপ্রেস স্বগতসংলাপ করে বলে, "আমি সামান্য কাঠের তৈরি প্রাণহীন একটা ট্রেন। কেউ প্রতিশোধ ও ঘৃণার এমন জঘন্য ভারী বোঝা আমার পিঠে চাপিয়ে দিক, আমি তা চাই না। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে আমাকে দিয়ে খাদ্য বহন করানো হোক। আমাকে দিয়ে গ্রামে ট্রাক্টর আর সার বহন করিয়ে নেওয়া হোক। আমাকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে যেন নিয়ে যাওয়া না হয়।

আমি চাই, আমার গাড়ির প্রতিটি বগিতে সুখী চাষি ও শ্রমিকের দল এবং তাদের স্ত্রীদের কোলে থাকবে পদ্মফুলের মতো সুন্দর শিশু। ওরা মৃত্যুকে নয়, বরং আগামী দিনের জীবনকে মাথা নত করে কুর্নিশ করবে। এই গল্পেও আমরা দেখি শেষ পর্যন্ত সুন্দর দিনের জন্যই স্বপ্ন দেখে পেশোয়ার এক্সপ্রেস। যার প্রতীকী সংলাপে আমরা বুঝতে পারি এই চাওয়া জাতি, ধর্ম, শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের।

খাজা আব্বাসের 'প্রতিশোধ' গল্পটি এক পিতার প্রতিশোধ নেবার গল্প। পিতা হরিদাস স্বামী স্বাক্ষী হন মেয়ের ধর্ষণ আর খুনের ঘটনার। বুকে দাউ দাউ জ্বলে আগুন। একটি মুসলমান তরুণির বুকে ছুরি না গেঁথে স্থির থাকতে পারে না হরিদাস। এক বেশ্যালয়ে সুযোগ মিলে। কিন্তু সেই তরুণিকে উন্মুক্ত করে দেখেন। স্তনের

জায়গায় স্তনের বদলে শুধু দুটো বীভৎস আঘাতের গোলাকার চিহ্ন। হরিদাসের মুখ ফসকে বেরেয়ে আসে 'বেটি' শব্দটি। এইসব গল্প আবেগের বাড়াবাড়ি হয়তো আছে কিন্তু দাঙ্গায় এর চাইতেও বীভৎস আর আশ্চর্য ঘটনা রয়েছে।

দাঙ্গার গল্প সংকলনে বাকি দুটো গল্প হচ্ছে আলাউদ্দিন-আল-আজাদের 'ছুরি' ও বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের 'অতন্দ্র'।

আলাউদ্দিন-আল-আজাদের 'ছুরি' গল্পটি দাঙ্গার ফলে মানুষের ভেতর তৈরি হওয়া তীব্র প্রতিহিংসার আগুনের ছবি। এখানেও এক পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। তবে এই গল্পে আছে প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হয়ে আবার জেগে উঠা মনুষ্যত্ব এবং শুভবুদ্ধি। আর এখানেই বোধহয় টিকে ছিলো সভ্যতায় ফিরে যাবার আলো। দাঙ্গার সময় ঢাকা শহরে তরুণ ছাত্র মনসুর দাঙ্গার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে। সিদ্ধান্ত নেয় শান্তি মিছিলের। এমন সময়ে কলকাতা ফেরৎ পিতার কাছে দাঙ্গায় ছোট ভাই আর চাচাতো বোনের মৃত্যুর সংবাদ পায়। শোকে, ক্রোধে, প্রতিহিংসার আগুনে যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে উন্মাদ হয়ে উঠে সে। মনসুরের বাবাও তাই ছেলের হাতে পিতাই ছুরি তুলে দেন। নিঃশব্দে হিংস্র জানোয়ারের মতো বের হয় দুই পিতা-পুত্র। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে দুই জোড়া চোখ। পাশের বাড়ির হিরন্ময়ী বাসায় তারা প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে। বিপদগ্রস্ত, আতঙ্কিত অসহায় হিরণ্ময়ী মনসুরকে পেয়ে হাতে আসমানের চাঁদ পান। অগাধ বিশ্বাসে তার ওপর নির্ভর করেন, ছেলেমেয়েসহ রিফিউজি ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে অনুরোধ জানান। তাঁর অসহায় অবস্থা আর করুণ মিনতি মনসুরের ভেতর জাগিয়ে তোলে মনুষ্যত্ববোধ। ফলে পিতার সঙ্গে বাধে সংঘর্ষ। পিতা বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করলেন ছেলেকে "তুই আমার ছেলে নয়। মীরজাফর।" তীব্র ক্রোধে নিজেই নিজেকে আঘাত করতে চান, কিন্তু আহত হয় ছেলে মনসুর। আহত অবস্থাতেই হিরণ্ময়ীর কাছে স্বীকার করে প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনার কথা- "ঘৃণা জেগেছিল আমার মনে... তখন আমি বুঝতে পারিনি, আমি চলেছি নিজের বুকে নিজেই ছুরি মারতে, ছুরি মারতে জীবনের বুকে।

তার বর্ণনা পাঠকের মর্মমূলক স্পর্শ করে। "আর কোনো সময় হলে হয়ত মনসুর চেঁচিয়ে উঠতো, কিন্তু এখন কথা শুনতে শুনতে ও যেন ধীরে ধীরে পাথর হয়ে গেলো। দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো সারা কামরায়, আকস্মাৎ হু হু কারে উঠলো তার মন, অনুশোচনার তীব্র বেদনায়। নতুন করে চোখের সামনে মুর্তিমান হয়ে উঠলো তার এতদিনের জীবনাদর্শ, তার যুক্তি-বিচার, তার স্বপ্ন। কোটের পকেটে বাঁটটা তখনো তার হাতে ধরা, আঙ্গুলগুলি ক্রমশ শিথিল হয়ে এসেছে। ঝরঝর করে দুচোখ থেকে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গাড়িয়ে পড়লো।" এই গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই সেই চিত্র যে চিত্র দেখি সমরেশবসুর আদাব আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'স্বাক্ষর' গল্পে। যেখানে মানবতা জয়ী হয় প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসা স্পৃহার কাছে ।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের অতন্দ্র গল্পের নায়ক রিক্সাচালক গরীব ওসমান মিয়া। এখানে দেখা যায় কিভাবে এইসব গরীব ও ক্ষুধার্ত মানুষকে দাঙ্গার দিকে খেপিয়ে আর লেলিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মৃত বুড়ির মরদেহ বন্ধু মঙ্গলের মৃত্যু তাকে ভাবায়। তার স্ত্রীর পরণে কাপড় নেই তাই সে মৃত বুড়ির দেহ থেকে কাপড়টা খুলে নিয়ে যায় কিন্তু একই সাথে সে উপলব্ধি করে " শালা আমরা জান দেই। গরীবকো কেই নেহি। বুঝলি শালা, গরীব হিন্দু আওর মুসলমান। এই সত্য উপলব্ধিও আমরা 'পালঙ্ক' গল্পের মকবুলের মধ্যেও দেখি, দেখি মনোজ বসুর ইয়াসিন মিঞার মধ্যে আর সমরেশ বসুর

'আদাব' গল্পে।

সাদাত হোসেন মান্টো দেশভাগ ও দাঙ্গার আরেক সফল গল্পকার। 'টিথওয়ালের কুকুর', 'শেষ স্যালুট', 'খুলে দাও', 'টোবা টেক সিং', 'শরিফান', 'সহায়', 'ঠাণ্ডা গোস্ত' ইত্যাদি গল্পে মান্টো দেশভাগ, দাঙ্গা এবং এইসব রাজনৈতিক সংঘাতের ফলাফল মানবিক বিপর্যয়ের নিখুঁত চিত্র গল্পে তুলে এনেছেন। মান্টোর কোনো কোনো গল্পে নৃশংসতা, অত্যাচার মানুষের বিকৃতি আর বীভৎসতার এমন কঠিন প্রকাশ ঘটেছে যে গল্প পড়ে আমাদের বিমূঢ় হতে হয়।

'শরিফান' গল্পের নায়ক কাসিম। হাঁটুতে ব্যথা বুলেট বিঁধে ছিল। বাড়ির দরজা খুলেই সে বিবির লাশ দেখতে পায়। তার চোখ দপদপ করে উঠে। কুড়াল তুলে খুনোখুনির এই লীলায় যাওয়ার সময় তার মনে পড়ল মেয়ে শরিফানের কথা। মেয়ের ঘরের দরজা ঠেলে খুলল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল সে; "হাত দু- এক দূরে পড়ে আছে এক তরুণির মৃতদেহ, সম্পূর্ণ ন্যাংটো, মেঝের ওপর চিৎপাত প্রাণ হীন।..." তার চোখ বুজে এল। গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।, "শরিফান!" কুড়াল হাতে বেরিয়ে পড়ল সে। তার বিবির মৃত্যুর, অনুভূতি ভুলে গেলো। শুধু তার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো উলঙ্গ শরিফানের ছবি।

কুড়াল হাতে পরিত্যক্ত বাজারের দিকে ছুটেছে কাসিম। চৌরাস্তায় এক শিখের মুখোমুখি হলে তাকে উপড়ে পড়া গাছের মতই ধরাশায়ী করে। একদল লোক "হর হর মহাদেও" বলে চ্যাঁচাচ্ছিল। তীরের বেগে তাদের মধ্যে ঢুকে তিনজনকে হত্যা করে। তার নিজেরও মরতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে, " শরিফানকে...উলঙ্গ শরিফান..."। আবার ও একটা জ্বলন্ত লাভার মত সে ছুটে চলে রাস্তা দিয়ে। হাট বাজার সব ফাঁকা, পরিত্যক্ত। একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে। কুড়াল দিয়ে দরজা ভেঙে ছোট বাড়িটার ভেতর ঢুকল। সে চেঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে বললে দরজা খুলে এক তরুণী এসে দাঁড়াল। "কঠোর স্বরে কাসিম জিজ্ঞেস করল: কে তুমি?" মেয়েটি জানাল, 'হিন্দু'। জ্বলন্ত চোখে মেয়েটিকে দেখলো সে। বয়স পনেরো হবে কি না সন্দেহ। মেয়েটাকে বাজপাখির মত ছো মেরে নিয়ে এল উঠানে। পাগলের মত দু -হাত দিয়ে তার পোশাক ছিঁড়তে লাগল। প্রায় আধঘন্টা ধরে সে তার প্রতিশোধ নিল। সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি পাবে বলে সে মেয়েটির দিকে তাকাল। " দু-হাত দূরেই পড়ে আছে মেয়েটির মৃতদেহ। ন্যাংটো, সম্পূর্ণ উলঙ্গ...ফরশা, সুগঠিত সুঠাম শরীর, ছোট্ট দুটি আঁটো স্তন।" কাসিমের চোখ বুজে গেল।

কাসিমের পরিচিত এক লোক তলোয়ার হাতে বাড়িতে ঢুকে জানতে চাইল সে এখানে কি করছে? কাসিম কাঁপা কাঁপা হাতে ঢাকাটা দেখিয়ে ফাঁকা স্বরে বলে, "শরিফান..."। লোকটি এগিয়ে এসে ঢাকা খুলতেই উলঙ্গ শরীর দেখেই কেঁপে উঠল। তলোয়ারটা হাত থেকে পড়ে গেল। তার মুখ থেকে একটা শব্দই বের হল, "বিমলা... বিমলা..."। এই শরিফান আর বিমলা কারো মধ্যেই আমরা কোনো তফাৎ দেখি না। আমরা শুধু বুঝে নেই প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে গেছে নিস্পাপ দুটো প্রাণ আর কুসুমিত যৌবন। কে শরিফান আর কে-ই বা বিমলা আমরা শুধু দেখি পদদলিত মনুষ্যত্ব আর মানবতার পরাজয়।

উর্দু সাহিত্যের আরেক শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক রাজেন্দ্র সিং বেদীর অসাধারণ গল্প লজ্জাবতী লতা (লাজবন্তী) গল্পের নায়ক সুন্দরলাল হৃদয়ে পুনর্বাসন নামক একটি কর্মসূচির সম্পাদক। এই কর্মসূচির কাজ হলো দেশভাগে অপহৃত মহিলাদের পুনর্বাসন।

তারা একটি গান পাঞ্জাবি লোকগীতি "হাত লাই কমানী লাজওয়ান্তি দে বুটে অথাৎ এটি একটি লজ্জাবতী লতার চারা, হাত লাগালেই সংকুচিত হয়" । সুন্দরলালের স্ত্রী লাজবন্তিও অপহৃত হয়েছে। তার মন নাজুক। সে বহুদিন ফিরে আসে না। তাই তার ফিরে আসা নিয়ে সুন্দরলাল এখন আর ভাবে না। ভারত, পাকিস্তানের অপহৃত মহিলা মাঝে মাঝে বিনিময় হয়। ফিরে আসা নারীদের অনেকে গ্রহণ করে না। আপনজনরাও না চেনার ভান করে। কিন্তু এই কমিটি তাদের ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করে, পরামর্শ দেয়। একসময় হঠাৎ ওয়াগা সীমান্তে লাজবন্তীকে দেখা যায় ১৬ জন ভারতীয় মহিলার বিনিময়ে ১৬ জন পাকিস্তানী মহিলা ফেরৎ নিয়েছে ভারত। সুন্দরলাল লাজবন্তিকে পায়। সে মুসলিম মেয়েদের মতো মাথায় লাল ওড়না পরেছে। তাকে আরো লাবণ্যময়ী লাগছে। সে সুন্দরলালের ঘরে আসে। লাজবন্তি ফিরে আসার পরেও সুন্দরলাল হৃদয়ে জায়গা দাও কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। একসময় সে লাজবন্তি বা লাজুকে মারতো, ওরা ঝগড়া করতো। একদিন লাজবন্তি সুন্দরলালকে প্রশ্ন করে– আমাকে মারবে না তো?

সুন্দরলাল চোখে অশ্রু নিয়ে বলে- না, দেবী, না এখন আর মারধর করবো না। দেবী ডাক শুনে লাজু কাঁদতে থাকে। সে তার জীবনের সব বলতে চায়। কিন্তু সুন্দরলাল শুনতে চায় না। দেশভাগের পর তার দেহ দেবীর দেহে রূপান্তর হয়েছে, তাদের এখন ঝগড়া হয় না। মারপিট হয় না। লাজু বুঝে যায় যে অনেককিছুই হতে পারে কিন্তু পুনরায় সেই লাজু -তে পরিণত হতে পারে না। লাজুর চোখের অশ্রু সুন্দরলালের দেখার চোখ নেই । সে সকালের প্রভাতফরিতে সকলের সাথে গাইতে থাকে - এটি একটি লজ্জাবতী লতার চারা, হাত লাগালেই সংকুচিত হয়"। এই অসাধারণ গল্প আমাদের বুঝিয়ে দেয় দেশভাগ কি করে চিরচেনা দাম্পত্যকে বদলে দেয়। কেমন করে মানুষ একটা কাঁচের বস্তুতে পরিণত হয়। কিভাবে সম্পর্কগুলো একটা ছকবাঁধা পাথর সম্পর্কে পরিণত হয়। অপহৃতা নারী আর কোনোদিন আগের নারীতে পরিণত হয় না।

ইসমত চুগতাই এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'অনাহুত অতিথি' ও 'প্রতিবেশী'। 'অনাহুত অতিথি'-তে আমরা দেখি হঠাৎ জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়া একজন মুসলমানকে বিজু নামক এক নারী কীভাবে লুকিয়ে রাখে। তারপর নিরাপদে রাস্তায় বের করে দেয়। প্রতিবেশী গল্পে কীভাবে মুসলিম পরিবারের সাথে হিন্দু পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী হৃদ্যতা গড়ে উঠে। তারপর এই মুসলিম পরিবার যখন পাকিস্তান চলে যেতে চায় সবাই চলে গেলেও পরিবারের মা চরিত্রটি থেকে যায়। আর গল্পের শেষে আমরা দেখি সেই হিন্দু পরিবারের প্রধান কর্তা ডাক্তারবাবু কেমন করে সবাইকে স্টেশন থেকে ফিরিয়ে আনেন। বলেন– এই দেখ, তোমার কুপুত্তুরদের কলোনি জংশন থেকে ধরে এনেছি। পালাচ্ছিল। বদমাইশের দল কোথাকার!

খাজা আহামদ আব্বাসের একটি বিখ্যাত গল্পের নাম 'সর্দারজী' শিখবিদ্বেষী এক মুসলমানকে বাঁচাতে প্রাণ দেয় এক সর্দারজী আর মৃতুর সময় বলে যায় তাকে এবং তার পরিবারকে বাঁচাতে প্রাণ দিয়েছিলো আর এক মুসলমান। এভাবে দেশবিভাগের এইসব গল্পে আমরা দেখতে পাই সম্প্রীতি আর মানবতা।

সরদার জয়েনউদ্দীনের 'ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা' গল্পে নিত্যানন্দ মুখুজ্জে ওরফে 'নিতাই দা' যাত্রার দলে কমিক পাঠ করে, সে তার পাঠ দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে হাসায়, নিজেও থাকে সবসময় হাসিখুশি। নিত্যানন্দের মুখের এই হাসি যেন দেশের ভালো থাকা আর মন্দ থাকার প্রতীক। প্রথম তার মুখের হাসি ম্লান হলো তেতাল্লিশের

আকালের সময়ে। মানুষ খেতে পায় না, মানুষ গ্রাম ছাড়ছে নিতাই ভেঙ্গে পড়লে। তার ভয় হলো, মানুষের হাসি কি চিরদিনের জন্য ফুরিয়ে গেল? সে মহাদুর্দিন কেটে গেলো যদিও ঝরে গেলো বহু প্রাণ। নিতাইও জেগে উঠতে চাইলো কিন্তু নিতাইয়ের মুখের হাসি দ্বিতীয়বারের মতো শুকিয়ে গেল ছেচল্লিশের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায়। রাতারাতি হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ভয়ংকর শত্রু হয়ে উঠল। কোথায় হারাল হাসি-গান-প্রাণের সে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধারা। এমনকি দাঙ্গা থামলেও প্রাণের সে বাঁধন আলগা হয়ে গিয়েছে তা আর জোড়া লাগল না। নিতাইয়ের সজীব হাস্যময় প্রাণের মৃত্যু হল, সে মানুষটা বেঁচে রইল তা নিত্যানন্দের প্রকৃত অস্তিত্বের মমি, মৃত এক সত্তা। প্রকৃত অর্থেই যেন আমাদের সেই বন্ধন আলগা হয়ে গেছে। সেই সৌহার্দ্য সেই বিশ্বাস যেন আর ফিরে আসেনি। গল্পটির মান শিল্পমানে খুব বেশি উত্তীর্ণ না হলেও দেশভাগের ফলে যে ভ্রাতৃত্ববোধের মৃত্যু ঘটেছে, আমাদের সম্পর্ক যে প্রাণহীন মমিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এই গভীর সত্য উদঘাটিত হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'সুর্মা-সিদুর' গল্পটির নামকরণেই বোঝা যায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটি গল্প। ভয়াবহ দাঙ্গার সময়ে চিকিৎসার অভাবে রুগ্ন শিশু সন্তানটিকে হারিয়েও সুখেন্দু জন্মভূমি ছাড়তে রাজি নয়। দাঙ্গার পর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হলে বন্ধু মাহবুবের দাওয়াত রক্ষার জন্য সুখেন্দু স্ত্রীকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় যাচ্ছে। এই যাত্রা পথে দেখা যাচ্ছে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের নানা অনুসঙ্গ। যা বলে দেয় দাঙ্গা আর দেশভাগ কি গভীর বিভেদের রেখা টেনে দিয়েছে এই দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে। ট্রেনের কামরায় কপালে সিদুঁরের বদৌলতে সুখেন্দুর স্ত্রীর ধর্মপরিচয় জানতে পেরে অনেকে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে শুরু করে তর্ক। একজন বলে, "আরে মিয়া রাখো। হিন্দুরা মুসলমানদের মানুষ বলেই গণ্য করে না।" উত্তরে আর একজন পাল্টা যুক্তি দেখায়-"বলি, মুসলমানরাই কম যায় কিসে? বিধর্মী যত ভালোই হোক -সে কাফের!" অস্বস্তিসূচক বিতর্কের নীরব শ্রোতা হবার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় তারা গন্তব্যে পৌঁছে বন্ধু দম্পতির উষ্ণ অভ্যর্থনায়। কিন্তু তাদের সন্তানকে দেখে আবার হাহাকার হয়ে উঠে সুখেন্দুর স্ত্রীর মাতৃসত্তা-সেই মুখ - সেই হাসি - সেই চোখ। শিশুর ডাক নামটিও ওরা রেখেছে বকুল-সুখেন্দুর হারানো শিশুর নামে। তাকে জড়িয়ে শোকার্ত মায়ের মন শান্ত হয়। বাড়ি ফিরে যাবার সময়ে ট্রেনের চাকার শব্দে অসংখ্য মানব শিশুর কণ্ঠস্বর আর সহাস্য করতালি শুনতে পেল সুখেন্দুর স্ত্রী-"চোখে তাদের জীবনের টলটলে সুষমা, সারা শরীরে মানবী মাতার গর্ভকোষের আদিম পবিত্রতা। ওরা কি এসেছে ফিরে?" মাতৃহৃদয়ের এই উদ্বেল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই গল্পের সমাপ্তি। এ পরিসমাপ্তি কাব্যিক। তবে এখানেই যেন প্রশ্ন যারা দাঙ্গায় নানা কারণে চলে গিয়েছে না ফেরার দেশে তারা কি সত্যিই চলে গেছে? নাকি তাদের আত্মারা এখানেই রয়ে গেছে এই স্বাধীন দেশে। আত্মাগুলো প্রতিবাদ করছে, তাদের এই অপমৃত্যুও নাকি অসংখ্য অতৃপ্ত আত্মার গোঙানি আর গুঞ্জরণ মিশে আছে এই আমাদেও নিত্যকার স্বাভাবিক জীবনে।

গল্পের কথাবস্তু যেন কুললিত শব্দসম্ভার পরিপূর্ণ কাব্য-ভাবনার অপ্রতিরোধ্য দাপটের কাছে বারবার হার মানে। কথাবস্তু তখন যেন কবিতায় পর্যবসিত হয়। তথাপি বাস্তবতার অভিক্ষেপে, মনন ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, মানব মনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটনে এবং নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পপ্রয়োগে আলাউদ্দিন-আল আজাদ নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী গল্পকার।

চল্লিশের দশকেই ছোটগল্পকার হিসাবে আবির্ভূত হন শওকত ওসমান, সামাজিক

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতা তার গল্পের প্রধান বিষয়। শওকত ওসমানের 'পিঁজরাপোল' (১৯৫১) গল্প গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। এই গ্রন্থের 'আলিম মুয়াজ্জিন' গল্পের আলিম এক সময় মুয়াজ্জিনের কাজ করত। আজান দিয়ে মানুষকে নামাজে ডেকে আনাই ছিল তার পেশা, সেজন্য নিজেকে সে মনে করত আল্লাহর নকিব-ঘোষক। সেই আলিম মুয়াজ্জিন দেশবিভাগের পর পাগল হয়ে গেল। রাস্তায় লাল দাগ দেখলে পথিককে সাবধান করে, "দেইখ্যা চলেন, আঁর বাই মরছে। হের কত খুন।" সে নিজেকে কখনো হিন্দু, আবার কখনও রিফিউজি বলে দাবি করে, চিৎকার করে বলে, "আমি রিফিউজ্ ওদিকে খেদাইছে। এহানে কবর তৈরী কইর রাখছে" একদিন স্কুল কলেজের ছেলেদের শান্তি মিছিলের শ্লোগান-হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, দেশত্যাগী হব না-দাঙ্গাবাজ বরবাদ হোক"-শুনে এক লাফে সেই মিছিলে সামিল হল সে। সবাইকে আদেশ করল-"আজান দিতা আছিলা না ? আজান দ্যাও।" সে আজানের ভঙ্গিতে দুই কানে বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে এগিয়ে চলল আলিম মুয়াজ্জিন- যেন সে মুয়াজ্জিনের পদে আবার অভিষিক্ত হয়েছে। সে যেন মানুষকে ডাকছে আবারও শুভ কোনো কাজে, নামাজের জন্য। এই আলিম মুয়াজ্জিন ছিলো সুস্থ, ধর্মপ্রাণ এক আশাবাদী মানুষ। সেই আলিম মানবিকতার এই চরম বিপর্যয় দেখে হারিয়ে ফেলে মানসিক ভারসাম্য। কিন্তু তার এই ভারসাম্যহীনতাই যেন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় আমাদের মনুষ্যত্বহীনতা এবং মানবিকতার ক্ষয়কে। নষ্ট আর নিষ্ঠুর সমাজে যে ভালো মানসিকতার মানুষগুলোর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার কথা নয় সেই কথাটাই যেন বলা হয় পাগল আলিম মুয়াজ্জিনের মাধ্যমে। আবার এই চরিত্রটিই যেন আমাদের ডাক দিয়ে যায় ইতিবাচক কোনো পরিবর্তনের দিকে, সুন্দর এক পৃথিবীর দিকে। এই সব মানুষগুলোই যেন আমাদের বলে মানবতার জয়ের কথা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি 'তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের বিষয় উদ্বাস্তু আর অরক্ষিত মানুষ। পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেয় কিছু উদ্বাস্তু মানুষ। তারা দেখতে পায় একটা তুলসী গাছ। বোঝা যায় এই গাছটিতে হয়তো কেউ পুজা করতেন। কোন মমতাময়ী হয়তো গাছটির যত্ন নিতেন। আশ্রিত মানুষগুলো সেই মায়াবী মুর্তির কথা ভাবেন। তুলসী গাছটি তখন প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে। এই গাছটিতে পানি ঢেলে তারা আবার এটাকে তাজা করেন। তারপর একদিন আবার এই আশ্রিতদেরকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আবার তুলসী গাছটি শুকিয়ে যায়। একটি তুলসী গাছের শুকিয়ে যাওয়ার প্রতীকে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে অরক্ষিত মানুষের মর্মবেদনা আর হৃদয়ের শুকিয়ে যাওয়া। আবার সেই গাছের সাথেই দেখতে পাওয়া যায় মমতা ও মানবিকতার বন্ধন। এভাবেই মানবতার করুণ পরিণতি মানুষে মানুষে বিভেদের, ধর্মে ধর্মে ক্লেশ, রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার অসারতা বাংলা ছোটগল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এসব গল্পের ভেতর দিয়ে যেমন উঠে এসেছে দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র, তেমনি বেজে উঠেছে মানবতার শাশ্বত সুর আর সাধারণ মানুষের হৃদয়ের গোঙানি।

আব্দুল মান্নান সৈয়দের 'গল্প ১৯৬৪' দেশত্যাগী বন্ধুর বোনের সাথে বিশাসঘাতকতা ও অনুতাপের গল্প। এখানে আমরা শুনি কবীরের গল্প। কবির আবার এই গল্প করছেন লেখকের সাথে যিনি এখানে নতুন এসেছেন। একটি টিলার ওপর সুন্দর একতলায় থাকেন। কবির বলছিলেন বন্ধু অমলের কথা। কবীর আর অমল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অমলের বাবার ব্যবসা। মার সাথে অমল রাগ করে ম্যাট্রিক পাশ করেই আর পড়েনি। বাবার ব্যবসা ধরেছে। কবীর বিএ পাশ করে। হিন্দু-মুসলমানের এই বন্ধুত্বে কোনোই ফাঁক

ছিলো না, দূরত্বও ছিলো না। শুধু একবার অমলের জেঠি কবীরকে ঘরে ঢুকতে দেননি। জলের গ্লাস নিয়ে এসেছিলেন উঠানে। সেখানে দাঁড়িয়েই পানি খেয়েছিলো কবীর। ছোট হলেও অপমানিত বোধ করেছিলো সে। অমন একটা ব্যবহারে কবীরও লজ্জা পেয়েছিলো। এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সময় দাঙ্গা এলো। একদিন দেখা গেলো হিন্দু পাড়ায় আগুন। কবীর অমলদের সান্ত্বনা দেয়, সাহস দেয়। তারপরও ভয়ে ভয়ে থাকা। ওদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে কিছুদিন বাজার করেও দেয় কবীর। দাঙ্গা নিবারণী কমিটির সদস্য কবীর সাধ্যমতো সাহায্য করে অমলকে। একরাতে অন্য সবার মত অমলরাও দেশ ছাড়ে। যাবার আগে বন্ধু কবীরের কাছে বোন শোভাকে রেখে যায় দেখে রাখার জন্য। পরে এসে নিয়ে যাবে শোভাকে। শোভাকেও ছোটবেলা থেকেই দেখেছে কবীর। শোভাকে আড়াল করেই রাখে কবীর। শোভা মাটিতে শোয়, কবীর চৌকিতে। ভাগ করে খাবার খায়। সব ঠিক ছিলো। একরাতে কবীরের পশুভাব জেগে ওঠে। শোভাকে সে ধর্ষণ করে। শোভাও কিছু বলে না, হয়তো ভয়ে চিৎকারও দেয় না।। পরেরদিনই অমল আসে শোভাকে নিয়ে যেতে । মনে মনে খুব অনুতাপ হয় কবীরের। আহা আগের দিন যদি অমল আসতো তাহলে বেঁচে যেত সে, বেঁচে যেত শোভা। অমল, শোভা কেউ কিছু বলে না। কবীরের মুখ দেখেই কি অমল সব বুঝেছিলো? তাও জানে না কবীর। সমিতির সদস্যদের সাথে দেখা করে ফিরে এসে শোভা আর কবীরকে পায় না সে। ওদের বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে দেখে কেউ নেই। খা খা বাড়ি। বুকটা খালি হয়ে যায় কবীরেরও।

গল্পের শেষটা বেশ প্রতীকী। একটা সাপ দেখা যায় গল্পের শেষে। কবীর সাহেব বলেন- গরম পড়তে শুরু করেছে। এই সময় ওরা বেরোয়। এই সাপ যেন মানুষের প্রবৃত্তি। সুয়োগ পেলেই বেরোয়। যেমন একরাতে শোভাকে দংশন করেছিলো কবীরের প্রবৃত্তি। ।

হায়াৎ মামুদের 'অবিনাশের মৃত্যু' গল্পে দেখি অবিনাশের মৃত্যু। সন্ধেয় সে বের হয় প্রেমিকা সর্বাণীর কাছে যাবার জন্য, যাওয়া হয়নি। হায়দার আর অন্য বন্ধুরা মিলে দাবা খেলে রাত দশটা হয়ে গেছে। তারপর তিনদিন খুব খারাপ অবস্থা ছিলো শহরের। বের হওয়া যায়নি। সর্বাণীর চিঠি পেয়েছে– 'দীর্ঘদিন তোমায় দেখি না। আমাকে মনে পড়ে না? শিগ্গীর এসো। ভালোবাসা-সর্বাণী।'

তিনদিন পর সে বের হলো সর্বাণীর কাছে যাবে। অবশ্য এই তিনদিন ওর কাছে না গেলেও দিনগুলো ছিলো সর্বাণীময়। বের হয়ে দেখে একটা ঘর পুড়ে গেছে। সেই পোড়া ঘরে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। সে একটা সিগারেট কিনে ধরিয়ে পান খেয়ে দেখে স্কুল মাস্টার সুখদাররঞ্জন স্যার।

স্যার তাকে প্রায়ই বলেন- চলে যাও কোলকাতা পড়ালেখা শিখেছো এখানে কেন পড়ে আছো? অবিনাশ বলে-আপনি কেন যান না স্যার?

আমিও হয়তো সুযোগ পেলে যাবো। অবিনাশ আসে সর্বাণীর বাড়ি। না, ওরা নেই। কে যেন কর্কশ কণ্ঠে কথা বলে দরজা বন্ধ করে দেয়। কোথায় গেলো সর্বাণী। অবিনাশ ধানমন্ডি বন্ধু রহমতের বাসায় যায়। সর্বাণীর কথা বলে। কোথায় গেলো? ওর এক মামাও প্রায়ই ওকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। যেখানেই কি গেছে সর্বাণী? সর্বাণী যেখানে যাক ভালোর জন্য গেছে মনকে বোঝায় অবিনাশ। বিকেল গড়িয়ে যায়। রহমতের বোন পপি বলে- আজ থেকে যান। বাসায় আর কেউ তো নেই।

অবিনাশ তবু ফিরে আসে, বলে- কাল আবার আসবো। বের হয়ে ভাবে বাবাকে

কাল একটা টেলিগ্রাম করবে, জানাবে- বাবা ভালো আছি। সর্বাণীকে খুঁজবে। বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। স্কুল মাস্টার সুখদারঞ্জন বলে- যাচ্ছো কোথায়? এখনিতো সাইরেন পড়বে।

না, কিছু হবে না। এই তো পুলটা পার হলেই তো বাসা। অন্ধকার হয়ে যায়। অবিনাশ কোনো পুলিশ দেখে না। সেই পোড়া বাড়ি। ভাবনা কিসের শুধু তো ব্রিজটা পার হওয়া। কে একজন দৌড়ে আসে। একবার মনে হলো-আলী, অবিনাশ মুখ দেখতে গেলো দেখতে পেলো না। তারপর রক্তে ভেসে গেলো-

এই মৃত্যু, সর্বাণীর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া এই পোড়া বাড়ি সবকিছুই আমাদেরকে দেখায় দাঙ্গার এক নিখুঁত চিত্র। মানুষের কোনো অপরাধ ছিলো না। শুধু অপরাধ ছিলো কেউ মুসলমান, আর কেউ হিন্দু। এই অপরাধে তারা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছিলো। এভাবেই বাংলাছোটগল্পে নান্দনিকভাবে উঠে এসেছে দাঙ্গার সময় ও দাঙ্গার সময়ে মানুষের অসহায়ত্ব। আবার আমরা সহমর্মিতা সহঅবস্থানও দেখি। এই গল্পেও দেখি, রহমত অবিনাশকে থেকে যেতে বলেছিলো, অবিনাশকে ভালোবেসেই, হয়তো ওর নিরাপত্তার কথা ভেবেই বলেছিলো।

দেশভাগের উপরে হাসান আজিজুল হকের বিখ্যাত গল্প 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'। এই গল্পে আমরা দেখি দেশভাগের পর এক দরিদ্র বৃদ্ধ পিতা ও তার কন্যাকে। করবী গাছের প্রতীকে এখানে দারিদ্র্য, দেশভাগ, অশুচি জীবনের বিষময় জীবনধারণকেই ব্যঞ্জনাময় করা হয়েছে। নিরুপায় বৃদ্ধ পেটের দায়ে একমাত্র আত্মজাকে তুলে দেয় যুবকদের হাতে। ইনাম, ফেকু, সুহাসের কাছে কন্যার এই সম্ভ্রমহানি, এই দেহদানের বেদনা আর আত্মগ্লানিতে কুরে কুরে খায় বৃদ্ধকে- করবী গাছ লাগিয়েছে বৃদ্ধ। এই করবী গাছ যেন তার আত্মজার প্রতীক। দেশভাগ যেভাবে মানুষকে বিপন্ন করেছে অসহায় করেছে নিয়তির কাছে সমর্পিত করেছে তারই উদহারণ যেন এই কেশোবৃদ্ধ। এই গল্পের সবগুলো চরিত্রই নিম্নবর্গের। বুড়ো পেটের তাগিদে মেয়ের ঘরে পাঠিয়ে দেয় সুহাসকে। এই সুহাস নারীভেগের জন্য বড়ভাইয়ের পকেট মেরেছে। ফেকু বহ কষ্টে দুইটাকা জোগাড় করে আর ইনামের টাকা নেই বলে যে যেতে পারে না নারীর কাছে। সে বুড়োর গল্প শুনে। কিন্তু বুড়োর গল্প আর ফুরায় না। শীতের রাতে শীতের কুয়াশায় মরে। তাই বুড়ো একচটা গল্পই বলে চলে। রহস্যের মতো বুড়ো গল্প করছে, ভীষণ শীত করছে ওর, চাদরটা আগাগোড়া জড়িয়েও লাভ নেই। শীত তবু মানে, শ্লেষ্মা কিছুতেই কথা বলতে দেবে না তাকে। আমি যখন এখানে এলাম, আমি যখন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম ... তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না সারারাত ধরে সে বলছে– "এখানে যখন এলাম, আমি প্রথম একটা করবী গাছ লাগাই ... তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ সুহাস হাসছে হি হি হি– আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামলো বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এলো আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ—প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো। এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?

আঞ্চলিক ভাষার শিল্পিত ব্যবহারে, প্রতীকী এই গল্প দেশভাগ আর গৃহহারা ছিন্নমূল

মানুষের অসহায়ত্বকে অসাধারণভাবে তুলে ধরেছে। এই গল্প যেন একটি করবী গাছের নয় আমাদের সমাজের বিষ, ধর্মের বিষ আর বিষ খেয়ে বেঁচে থাকা বিষাক্ত জীবনকে ছবি। জীবন ধারণের যে গ্লানি তার এক মর্মন্তুদ কান্না।

পূর্ব বাংলার আরো অসংখ্য গল্পকার ছোটগল্পে তুলে এনেছেন দেশভাগ ও দাঙ্গার চিত্র। ছোট এই প্রবন্ধের এই পরিসরে তা আলোচনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। একইভাবে পশ্চিমবাংলা এবং উর্দূ ভাষার অনেক গল্পকার লিখেছেন দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে। দুই বাংলার গল্পকার, উর্দু ভাষার গল্পকারদের গল্পে এসেছে দেশবিভাগের নানা চিত্র, নানা অনুসঙ্গ। এই সব গল্পে গল্পকারদের কল্পনা আবেগের মিশেল হয়তো আছে তবে এই উপমহাদেশের গল্পকারদের হাতে উঠে এসেছে দেশ বিভাগের বিশ্বস্ত কিছু চিত্র। যে চিত্রগুলো দেশভাগের নিশংসতার, নিমর্মতার কথা বলে, কথা বলে ইতিহাসের ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়ের কথা সেই সাথে কথা বলে মানবিক বোধের জয়ের কথা সম্প্রদায়িত সম্প্রীতি ও সৌহার্দের কথা, এবং বিপরীতধর্মের ভাইয়ের জন্য বোনের জন্য প্রাণদানের কথা। মানবিক বিপর্যয় আর মানবিকতার জয়গাথা ঘোষিত হওয়ায় দেশভাগ ও দাঙ্গার এ গল্পগুলি দেশভাগের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে।